

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প: বাস্তবের ভেতরে অতিপ্রাকৃত স্পর্শ অপরাজিতা ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পসমূহে অতিপ্রাকৃত ভাবনা এমন এক বিশেষ শিল্পধারা, যা তাঁর মানবমনের গভীর অনুসন্ধান, নৈতিক বোধ, সামাজিক উপলব্ধি ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশে এক অনন্য সৃজনভুবন সৃষ্টি করেছে। অতিপ্রাকৃত বা রহস্যময় উপাদান রবীন্দ্রনাথের রচনায় কখনোই কেবল ভয়ের উদ্বেক বা চমক দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং মানবজীবনের অদৃশ্য শক্তি, উপলব্ধির সীমারেখা, মানসিক সংকট, স্মৃতি, অনুশোচনা, অপরাধবোধ, প্রেম এবং আধ্যাত্মিকতার মতো সূক্ষ্ম অনুভূতিকে প্রকাশ করারই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। এই অতিপ্রাকৃততা কখনো আসে স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমারেখা মিশিয়ে, কখনো চরিত্রের অবচেতন মনকে দৃশ্যমান করে, কখনো আবার অদৃশ্য এক শক্তির অস্তিত্বকে কাব্যিকভাবে প্রকাশ করে। ফলে রবীন্দ্র-গল্পে অতিপ্রাকৃততা কখনো ভয় নয়, বরং গভীর মানবিকতা ও ভাবনাত্মকতারই প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে বাস্তবতাকে অস্বীকার করে অতিপ্রাকৃত জগত সৃষ্টি করেননি; বরং বাস্তবতাকেই বিস্তৃত করে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যান, যেখানে মানুষের মানসিক অভিজ্ঞতা ও অদেখা অনুভূতি বাস্তবের সঙ্গেই মিলেমিশে যায়। তাঁর কাছে অতিপ্রাকৃততা ছিল মানুষের আত্মা, স্মৃতি ও অনুভূতির এক বিস্তার। ১৯৩৭ সালে প্রমথনাথ বিশিকে লেখা এক চিঠিতে, ঠাকুর একবার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সাথে তার দেখা হওয়ার কথা বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তা হয়েছিল ‘প্রেতবাণীবাহ চক্রজন’ বা ‘ভূতের বার্তা বহনকারী একটি চাকাযুক্ত যান’ এর মাধ্যমে। ঠাকুর যা উল্লেখ করেছিলেন তা অবশ্যই একটি প্ল্যানচেটের মতো ছিল। তাঁর স্মৃতিকথা ‘জীবনস্মৃতি’ তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে ‘যখন ঠাকুর পরিবারের একজন ক্যাশিয়ার কৈলাস মুখার্জির আত্মাকে ডাকা হয়েছিল, তখন তিনি তাঁর মৃত্যুর পরেই জীবিতদের কাছে যা শিখেছিলেন তা প্রকাশ করতে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছিলেন।’ এ প্রসঙ্গে

উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘নিশীথে’ গল্পটি। গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় মাঘ, ১৩০১ সালে। নিশীথে গল্পটিকে সমালোচকেরা অতিপ্রাকৃত ধারা-ভুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন মূলত নায়কের মানসিক অভিজ্ঞতার ভেতরে এক অদৃশ্য, ভয়াবহ উপস্থিতির ইঙ্গিত থাকার কারণে। গল্পে নায়কের অপরাধবোধ ক্রমশ ঘনীভূত হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে বাস্তব ও অবচেতন মনের সীমারেখা ভেঙে যায়। প্রথম স্ত্রীকে সে জীবদ্দশায় অবহেলা করেছিল তার অসুস্থতার সময় অন্য এক নারীর সঙ্গে গোপন সম্পর্ক তাকে এমন এক নৈতিক সংকটে ফেলেছিল যা সরাসরি মুখে না এলেও গভীর ক্ষোভ ও ব্যথা হয়ে প্রথম স্ত্রীর মনে দাগ কেটে যায়। মৃত্যুর আগে অসুস্থ স্ত্রী অন্ধকারে সেই মেয়েটিকে দেখে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করেছিল— “ও কে! ও কে গো!”— এই প্রশ্নটি যেন নায়কের জীবনের আর্তির উৎস হয়ে ফিরে ফিরে আসে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর নায়ক দ্বিতীয়বার বিবাহ করলে তার মনে হয় অতীতের সেই আর্তস্বরে এখনও প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে। যখনই সে নতুন স্ত্রীকে কাছে টানতে চায়, তখনই প্রথম স্ত্রীর স্মৃতি যেন অশরীরী উপস্থিতি হয়ে তাকে ঘিরে ধরে। নায়কের মনে জন্ম নেয় এক অদ্ভুত অনুভূতি তার প্রেমালাপের মুহূর্তগুলোকে যেন কেউ দূর থেকে দেখছে, কেউ তীক্ষ্ণ ক্ষোভে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে। আর এই অভিশাপের রূপেই গল্পে আসে সেই ভয়াল অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা। গল্পের এক পর্যায়ে দ্বিতীয় স্ত্রীকে ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে নায়ক যেন হঠাৎ শুনতে পায় ভয়ানক এক হাসির শব্দ। সেই হাসি কোনো নির্দিষ্ট দিক থেকে আসে না; বরং কৃষ্ণপক্ষের ফ্যাকাশে ভাঙা চাঁদের নিচে, গঙ্গার পূর্ব তীর থেকে পশ্চিম তীর পর্যন্ত হাহাকার তুলে এক অশরীরী ঝড়ের মতো বয়ে যায়। এই হাসি বাস্তবের নয় এটি তার অপরাধবোধের প্রতিচ্ছবি, কিন্তু তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় যেন কোনো মৃত আত্মার আর্তনাদের মতো। নায়ক উপলব্ধি করে, প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর স্মৃতি যেন পৃথিবীর প্রান্তরজোড়া বিস্তৃত হয়ে তাকে ঘিরে ধরেছে; সে মুক্ত নয়, বরং তার দোষ- স্বীকারের শূন্যস্থানটি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো অদৃশ্য শক্তি তাকে তাড়া করে চলেছে। এতে নায়ক প্রায় উন্মাদ হয়ে ওঠে— নিজে, নিজের প্রেম, নিজের সুখ সবকিছুকে সন্দেহ করতে শুরু করে। এইভাবে ‘নিশীথে’ গল্পে অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতা সরাসরি কোনো ভূতের উপস্থিতি নয়; বরং গভীর অপরাধবোধের মনস্তাত্ত্বিক বিস্তার। এক মৃত স্ত্রীর স্মৃতি নায়কের চেতনায় এমনভাবে দানা বাঁধে যে সে অশরীরী হাসিকেও বাস্তবের মতো অনুভব করে। অতীতের অপরাধতাড়না তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে, আর এই ছায়াই গল্পটিকে অতিপ্রাকৃততার বিশেষ মাত্রায় তুলে আনে যেখানে ভয় কোনো অদৃশ্য শক্তির নয়, বরং অন্তরের অপ্রশমিত পাপবোধেরই প্রতিধ্বনি।

‘জীবিত ও মৃত’ গল্পটি প্রকাশিত হয় শ্রাবণ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দে। গল্পে কাদম্বিনীর চরিত্র এমন এক সংকটকে ধারণ করে, যা জীবিত ও অদৃশ্য জগতের মাঝামাঝি এক শূন্য প্রদেশে আটকে পড়া মানুষের অসহায়তার প্রতিচ্ছবি। জমিদারবাড়ির বিধবা বধূ হিসেবে কাদম্বিনী পিতৃগৃহ ও স্বশ্রমকুল কোথাও নিজের অস্তিত্বের জন্য কোনো স্বাভাবিক আশ্রয় খুঁজে পায়নি। শারদাশংকরের পরিবারই তার একমাত্র ভরসা, আর সেই পরিবারের ছোট ছেলেটিকে সে অকৃত্রিম স্নেহে বড় করে তোলে। কিন্তু এই পরিবারও তাকে সত্যিকার জায়গা দিতে পারে না; তার অবস্থান যেন সর্বদাই পরবাসীর মতো। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হলে দ্রুত শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। কিন্তু সৎকারের আগেই সে সম্বিৎ ফিরে পায়। সেই মুহূর্তে শ্মশানসঙ্গীদের আতঙ্কে পালিয়ে যাওয়া এবং পরে পরামর্শ করে সকলের সামনে কাদম্বিনীকে ‘মৃত’ বলেই ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত তাকে চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন মানুষে পরিণত করে। এভাবেই তাকে সমাজ মৃতপ্রায় দেহ বলেই স্বীকৃতি দেয়, ফলে চাইতে না চাইতেই সে হয়ে ওঠে ‘প্রেতচারী’- মানুষ যার প্রতি তাকায় এক ভয়ের দৃষ্টিতে, আর সমাজ যার অস্তিত্বকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পরই তার মৃত্যুশয্যার দৃশ্যগুলো আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে চারপাশে শোকগাথা, আর্তনাদ, সবার উদাসীন বিচ্ছেদবোধ তাকে আঘাত করে। সেই দুঃসময় পার হওয়ার পরেও কাদম্বিনী প্রকৃতিকে অনুভব করতে পারে ভেকের ডাক, বজ্রের আলো, চেনা মাঠ, পুরনো বটগাছ সবই তাকে আবার জীবনের বাস্তবতার দিকে টেনে আনে। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে আরেকটি উপলব্ধি তাকে আচ্ছন্ন করে এই পৃথিবী তাকে জীবিত স্বীকৃতি দেয় না; সে প্রকৃত মানুষের সমাজে ফিরে যাওয়ার অধিকারও যেন হারিয়েছে। শরীর বেঁচে উঠলেও সে জানে, বাঁচা আর ‘বাঁচার অনুমতি পাওয়া’ এক জিনিস নয়। ফলে শুরু হয় ভয়ংকর দ্বন্দ্ব সে কি জীবিত, নাকি মৃত? এই অস্তিত্ব-সংশয় তাকে ভেতর থেকে ক্ষয় করে। নিজের প্রতি করুণা আর অসহায়তা প্রকাশ করতে গিয়ে সে ঈশ্বরকে প্রশ্ন করে— কেন তাকে এমন এক অসম স্থানে রেখে দেওয়া হলো যেখানে জীবিতের জায়গা নেই, মৃতেরও নেই? যদি ঈশ্বর তার জন্য আর কোনো স্থান না রাখেন, তবে কেনই বা সে মানুষের সংসারের আঙিনায় ঘুরে বেড়ায়? এই প্রশ্নগুলিই তার ভেতরের দহনকে আরও তীব্র করে তোলে। সে বুঝতে পারে তার মূল যন্ত্রণাটা শারীরিক মৃত্যু নয়; বরং সামাজিক মৃত্যুই তাকে সর্বাধিক আঘাত দিয়েছে।

এদিকে রানিহাটি থেকে শ্রীপতি ফিরে আসার পর কাদম্বিনীর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে যোগমায়ার সঙ্গে তার বিতর্ক তীব্র হয় কাদম্বিনী সত্যিই মরেছে কি না। ঠিক সেই মুহূর্তেই কাদম্বিনী ঘরে প্রবেশ করে। তার প্রবেশ যেন বাতাসের ঝাপটা হয়ে আসে

প্রদীপ নিভে যায়, ঘরে নেমে আসে রহস্যময় অন্ধকার। কাদম্বিনী নিজের পরিচয় জানায়, আর তার কণ্ঠে শোনা যায় এক ভয়াবহ আত্মস্বীকার— “আমি তোমাদের কাদম্বিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই।” সে যেন নিজেকেই মৃত বলে ঘোষণা করে, যদিও তার দেহ-মন দুটোই সচল। মৃতের পরিচয় সমাজ তাকে দিয়েছে, তাই সেই পরিচয়কেই যেন সে নিজের ভাগ্য বলে মেনে নিচ্ছে। তার প্রশ্ন— “আমি মরিয়া আছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কি অপরাধ করেছি?” এই আক্ষেপে ফুটে ওঠে এক গভীর বঞ্চনার বেদনা। যদি সে পৃথিবীতে জায়গা না পায়, আর মৃত্যুর পরলোকেও আশ্রয় না মেলে, তবে সে কীভাবে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবে? এই প্রশ্ন তার মর্মাস্তিক সংকটকে আরও তীব্র করে তোলে। নিরুপায় হয়ে সে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায়— প্রমাণ করতে চায়, সে মৃত নয়। তাই কপালে কাঁসার বাটি দিয়ে আঘাত করে রক্ত বের করে সবাইকে দেখায় যে তার দেহ এখনও জীবনের স্বাক্ষর বহন করছে। তবু তাকে বিশ্বাস করা হয় না। এই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে পরিব্রাণের শেষ পথ হিসেবে সে মৃত্যুকেই অবলম্বন করে কারণ মৃতের পরিচয় পাওয়ার পর সমাজ তাকে মানতে না চাইলে, সত্যিকারের মৃত্যু ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না। গল্পটি শেষ হয় চলচ্চিত্রগত তীব্রতা নিয়ে— “কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।”

এই একটি বাক্যই কাদম্বিনীর সমগ্র যন্ত্রণার সারমর্ম। জীবিত অবস্থায় সে প্রমাণ চাইতে চাইতে ক্লান্ত, তাই মৃত্যুকেই ব্যবহার করে জীবনের দাবি জানায়। মৃত্যু তার কাছে প্রতিবাদ হয়ে ওঠে এক নির্মম সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সবচেয়ে চূড়ান্ত মূল্য পরিশোধ করে সে জানিয়ে যায় নিজের সত্যতা। এভাবেই ‘জীবিত ও মৃত’ গল্পে কাদম্বিনীর চরিত্র অতিপ্রাকৃততার ছায়া মাখলেও বাস্তবের নির্মমতা, অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব এবং সমাজের নিষ্ঠুর বিচ্ছিন্নতা তার কণ্ঠকে আরও ভারী করে তুলেছে।

‘মণিহার’ গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্পের মধ্যে একটি গল্প। গল্পটি প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ, ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। ‘মণিহার’ গল্পে অতিপ্রাকৃত পরিবেশ এক গভীর, শীতল স্রোতের মতো গল্পের প্রতিটি স্তরে অনুভূত হয়। ফণিভূষণ নামের এক ব্যবসায়ী তার জীবনে যে সংকটে পতিত হয়, তাকে রক্ষা করার মতো সম্পর্ক বা সহমর্মিতার স্পর্শ সে নিজের স্ত্রী মনিমালিকার কাছ থেকে পায় না। মনিমালিকা রূপগরিমা আর গহনার প্রতি অগাধ আসক্ত; স্বামীর দুরবস্থা, দুঃখ কিংবা আর্থিক বিপর্যয় যেন তার অনুভূতির সীমাকে স্পর্শ করে না। ব্যবসা যখন রীতিমতো ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়, ফণিভূষণ ভেবেছিল মনিমালিকার অতি প্রিয় গয়নাগুলো হয়তো তাকে

বিপদ থেকে বাঁচাবে। কিন্তু মনিমালিকা স্বামীর দুঃসময়ে এগিয়ে আসার বদলে নিজের অলংকারকেই প্রাণের চেয়েও বেশি মূল্য দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকে। এই আসক্তিই শেষ পর্যন্ত তার জীবনকে অন্ধকার গহ্বরে টেনে নেয়, এবং সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

মনিমালিকার মৃত্যুর পর থেকেই ফণিভূষণের জীবনে শুরু হয় এক অজানা, অস্থিরতাময় অভিজ্ঞতা। ঠিক মধ্যরাতে সে প্রথম শুনতে পায় নদীর ঘাট থেকে ভেসে আসা এক অদ্ভুত শব্দ ঠকঠক ধ্বনির সাথে মিশে থাকে অলংকারের বনবানানি, যেন গয়নার ভারে দুলে দুলে কেউ সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। শব্দটি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বাড়ির সামনে এসে থেমে যায়। এই রহস্যময় উপস্থিতি ফণিভূষণের মনে যে ভয় সঞ্চার করে, তা কেবল অশরীরী শক্তির ভীতি নয়, বরং এক গভীর অপরাধবোধ এবং অস্বীকারযোগ্য স্মৃতির আতঙ্ক। পরদিনও একই ঘটনা ঘটে নিঃশব্দ রাত্রির বুক চিরে সেই একই শব্দ তার দ্বারে এসে থামে, যেন কেউ অদৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার দরজার আড়ালে। অতিপ্রাকৃততার আসল রূপ দেখা দেয় সেই রাতে, যখন ফণিভূষণ মৃদু আলোয় উপলব্ধি করে যে ঘরে নবোদিত দশমীর চাঁদের আলো ঢুকে পড়েছে। সেই নরম আলোর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ভয়াবহ দৃশ্য একটি কঙ্কাল, যা মাথা থেকে পা পর্যন্ত অলংকারে মোড়া। কঙ্কালের প্রতিটি অস্থিতে ঝুলে আছে মনিমালিকার প্রিয় গয়নাগুলি আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, বাহুতে বাল্য-বাজুবন্ধ, গলায় কোষ্ঠি, মাথায় সিঁথির গহনা সবকিছুই সোনা আর হীরের আলোয় দপদপ করছে। অলংকারগুলো ঢিলা, প্রায় খসে পড়ার মতো, কিন্তু তবুও অদ্ভুতভাবে আঁকড়ে আছে শুকনো অস্থিগুলোকে। এই অস্বাভাবিক দৃশ্যের সঙ্গে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো সেই মুখমণ্ডল কঙ্কালের দু'টি চোখ মৃত নয়, বরং জীবন্ত। সেই কালো চোখের তারা, দীর্ঘ পল্লব, সজল উজ্জ্বলতা সবকিছুই মনিমালিকার সেই পরিচিত দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে, যেটি কখনো ফণিভূষণকে আকর্ষণ করেছে, কখনো আবার অবহেলার বিষ ঢেলেছে। সেই চোখের দৃঢ়, শান্ত, অথচ অচঞ্চল দৃষ্টি যেন মৃত্যুর গহ্বরে থেকে ফিরে এসে ফণিভূষণকে প্রশ্ন করছে তার সংগ্রহ করা গয়নাই কি তার শোকের কারণ? নাকি স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার অভাবই এই অশরীরী প্রত্যাবর্তনের জন্ম দিয়েছে? এই দৃশ্য কেবল অতিপ্রাকৃত আতঙ্ক নয়; এর ভেতরে মিশে আছে মনিমালিকার জীবনের যন্ত্রণা, আসক্তি এবং স্বামীর প্রতি অদৃশ্য দূরত্বের প্রতিফলন। মনিহারা গল্পের এই ভৌতিক অভিজ্ঞতা আসলে মানুষের লোভ, অবহেলা এবং সম্পর্কের অবক্ষয়ের এক ভয়াবহ পরিণতি, যা মৃতের রূপে ফিরে এসে জীবিতকে তার ক্রটির মুখোমুখি দাঁড় করায়। এভাবেই গল্পটি

অতিপ্রাকৃততার আড়ালে মানবমনের গভীর ভাঙনকে নির্মম স্পষ্টতায় তুলে ধরে। এছাড়াও ‘ক্ষুধিত পাষণ’, ‘কঙ্কাল’ গল্পগুলিতে অতিপ্রাকৃতের সেই বিভীষিকা রূপটি প্রকাশ পায়। এককথায় বলতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে অতিপ্রাকৃত ভাবনা শুধুই রহস্য বা ভৌতিক অভিজ্ঞতা নয়; বরং মানবমনের গভীর সত্তাকে প্রকাশের এক বিশেষ উপায়। তিনি মানুষের অভিজ্ঞতার অদৃশ্য স্তর, স্মৃতির ভেতর লুকিয়ে থাকা যন্ত্রণা, অপরাধবোধের অস্থিরতা, প্রেমের আধ্যাত্মিক রূপ, সমাজের নিষ্ঠুরতা, জীবনের অনিত্যতা এবং মৃত্যু অতিক্রমী মানবচিন্তার শক্তিকে এমনভাবে গল্পে মিশিয়েছেন যে অতিপ্রাকৃত ভাবনা হয়ে উঠেছে মানবতাবোধেরই স্বাভাবিক সম্প্রসারণ। তাঁর গল্পের অতিপ্রাকৃততা যতটা রহস্যময়, তার চেয়েও বেশি মানবিক; যতটা অপরিচিত, তার চেয়েও বেশি পরিচিত মানুষের অন্তর্দৃষ্টিতে; যতটা অদ্ভুত, তার চেয়েও বেশি বাস্তবেরই অন্তর্গত। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্পসমূহ তাই বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সৃষ্টি যেখানে অতিপ্রাকৃততা কখনো ভীতি নয়, বরং অনুভূতি; কখনো চমক নয়, বরং দার্শনিক সত্য; কখনো অন্ধবিশ্বাস নয়, বরং মানবমন ও সমাজজগতের গভীর অনুসন্ধানের ফল। তাঁর অতিপ্রাকৃত জগৎ মানুষের হৃদয়েরই বিস্তার যেখানে অদৃশ্য শক্তি বলতে বোঝায় অমীমাংসিত ব্যথা, স্মৃতির আর্তি, মনোজাগতিক টানাপোড়েন এবং সৌন্দর্য অনুসন্ধানের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে অতিপ্রাকৃত ভাবনাকে মানবিকতা ও শিল্প সৌন্দর্যের এক উচ্চস্তরে নিয়ে গেছেন, যা বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাকে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা; আর পাঠকের মনে জাগিয়ে তোলে পরিচিত জগতের মধ্যেই অচেনা সত্যের সন্ধান।